প্রথম অধ্যায়

পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও সারস্বত সাধনায় নবদ্বীপের স্থান , তৎকালীন নবদ্বীপের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিচয় ।

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও সারস্বত সাধনায় নবদ্বীপের স্থান। তৎকালীন নবদ্বীপের আর্থ, সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিচয় :

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের 'কুলিয়া' গ্রামই বর্তমানে 'নবদ্বীপ' নামে পরিচিত। 'সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম'[১]কে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন, "নবদ্বীপ হেন ধাম ত্রিভুবনে নাই।"[২] কবি জয়ানন্দের ভাষায় — "ভূমি স্বর্গ নবদ্বীপ পৃথিবী মণ্ডলে।"[৩] শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী তাঁর বিরচিত শ্রীমন্নবদ্বীপাষ্টকে স্মরণ করেছেন —

"যস্মে পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ
কেচিচ্চ গোলোক ইতীরয়ন্তি।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তত্ত্বজ্ঞা
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ২নং শ্লোক ॥

নবদ্বীপ ধামের পরিচয় প্রসঙ্গে এ যুগের দার্শনিক ভাগবত গঙ্গোত্তরী ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী বলেছেন, — "ভারতবর্ষ বৈকুণ্ঠের আঙ্গিনা। তার পূর্ব সীমান্তস্থ একটি প্রদেশ — নাম বঙ্গদেশ। ভারত জননীর কোলে একটি আদরের কন্যার মত তার অবস্থান। নবদ্বীপ বঙ্গভূমির একটি শ্রেষ্ঠ নগরী। রাজকীয় রাজধানী নয়। সাংস্কৃতিক রাজধানী বটে। ধনে, ঐশ্বর্য্যে, বিদ্যাবত্তায় নবদ্বীপ একটি সমুজ্জ্বল ধাম।"[৪] নবদ্বীপ ছিল শাস্ত্রচর্চার লীলাভূমি। বিশেষতঃ ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্রের আলোচনায় নবদ্বীপ ছিল সবার উপরে। অসাধারণ ধী-সম্পন্ন বাসুদেব সার্বভৌম, তার্কিক চূড়ামণি রঘুনাথ শিরোমণি ও স্মার্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, তন্ত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী নবদ্বীপ নগরীকে অলংকৃত করে রেখেছিলেন।

ন্যায় চর্চা

বহুকাল থেকে ন্যায়-শাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল মিথিলা। মিথিলার পন্ডিতবর্গ তাঁদের গ্রন্থ অন্য কোথাও নিয়ে যেতে দিতেন না। ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হ'লে নবদ্বীপের ও অন্যান্য স্থানের বিদ্যার্থিগণকে মিথিলায় যেতে হ'ত। মিথিলাবাসী পন্ডিতেরা গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণতা দেখে শঙ্কিত ছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণরা মিথিলার আধিপত্য হয়ত একদিন নষ্ট করে দিতে পারে। এই আধিপত্য রক্ষা করার জন্য তাঁরা গৌড়বঙ্গের কোন ছাত্রকে ন্যায়ের কোন গ্রন্থ তাঁদের সঙ্গে আনতে দিতেন না। কাজেই গ্রন্থের অভাবে নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত না। বাসুদেব সার্বভৌম এই অভাব দূর করে ন্যায় চর্চায় নবদ্বীপকে মিথিলার সমপর্যায়ে সমুন্নত করেছিলেন।

শোনা যায়, বাসুদেব বাল্যকালে বিদ্যাবিমুখ ছিলেন। চঞ্চলমনা বালক বাসুদেবের পিতা শ্রীমহেশ্বর বিশারদ পুত্রের বিদ্যা বিমুখতায় যারপরনাই আশাহত হয়ে তাঁর পত্নীকে খেদোক্তি করে বললেন, "অমন পুত্রের মুখে ছাই দিতে হয়।"[৫] পতিপ্রাণা মহেশ্বর পত্নী ব্যথিত চিত্তে সন্তান বাৎসল্যের অশ্রুধারা একান্তে নিজের গোপন মনের ভিতরে রেখে পতিদেবের আদেশ পালন পূর্ব্বক তাঁর সন্তানকে অনুগ্রহণ করাবার সময় কিছুটা ছাই তাঁর খাবারের পাশে রেখে দিলেন। এতে বাসুদেব অত্যন্ত লজ্জিত ও মর্মাহত হয়ে গৃহত্যাগ করলেন এবং কোন এক বনে গিয়ে মনের দুঃখে অবিরাম কাঁদতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ সেই বনমধ্যে দৈববাণী হল — "বৎস আমি এইখানে বনমধ্যে প্রস্তররূপে আছি। আমাকে পূজা কর। তুমি শ্রুতিধর পন্ডিত হইবে।"[৬]

বাসুদেব তখন বন থেকে বনান্তরে তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করলেন এবং অবশেষে গভীর বনমধ্যে কোন এক বটবৃক্ষমূলে প্রস্তররূপিণী দেবীমূর্ত্তি দেখতে পেলেন। তারপর তিনি সেখানেই দেবীর ঘট প্রতিষ্ঠা করে ভক্তি-সহকারে নিয়মিত দেবীর পূজার্চনা করতে লাগলেন। তাঁর আরাধনায় দেবী প্রসন্ন হলেন এবং দেবীর বরে তিনি মহাপন্ডিত হয়ে খ্যাতি লাভ করেন। এই অধিষ্ঠাত্রীর দেবীই নবদ্বীপের পোড়ামা, পরমা বা পড়ুয়ার মা নামে অদ্যাপিও বিরাজমানা আছেন।

রাজা ভগীরথ যেমন মা গঙ্গাদেবীকে মর্ত্তে আনয়ন করেছিলেন, ঠিক সেইরকম ভাবেই বাসুদেব মিথিলায় গিয়ে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের বিরাট গ্রন্থ 'চিন্তামণি' কণ্ঠস্থ করে নবদ্বীপে নিয়ে আসেন এবং বিদ্যানগরে ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। শত শত অনুরাগী বিদ্যার্থী বিদ্যালাভের আশায় বিদ্যানগরের টোলে যোগদান করে টোলকে অলংকৃত করতেন।

রঘুনাথ শিরোমণি বাসুদেবের ছাত্র ছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌম যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে তাঁর প্রতিভাবান শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁর থেকেও সুগভীর তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই যোগ্য শিষ্যকে মিথিলায় প্রেরণ করলেন। সেই-সময় সফল বিদ্যার্থীদের উপাধি প্রদান করার বিশেষ ক্ষমতা একমাত্র মিথিলার পন্ডিত-বর্গের উপরই ন্যস্ত ছিল। সুপন্ডিত শ্রীবাসুদেবের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীরঘুনাথ শিরোমণি যথাকালে বিদ্যালাভে কৃতিত্ব অর্জন করে সসম্মানে 'উপাধি' প্রদান ক্ষমতা নিয়ে মিথিলা থেকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। অনন্তর পন্ডিতপ্রবর শ্রীরঘুনাথ, পক্ষধর মিশ্রের ন্যায় মহাপন্ডিতকেও শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করেন। ভুবনবিখ্যাত একচক্ষু পন্ডিতপ্রবর শ্রীরঘুনাথ 'বাণভট্ট' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং শ্রীগঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি'র উপর 'চিন্তামণি দীধিতি' নামে একটি টীকা রচনা করেন। তখন থেকেই নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের শুভারম্ভ হয়েছিল বলা যায়।

রঘুনাথের ছাত্রগণের মধ্যে মথুরানাথ, জানকীনাথ ও রামভদ্র শ্রেষ্ঠ। মথুরানাথ দীধিতির 'সরলা টীকা' রচনা করেন। জানকীনাথ 'ন্যায় মঞ্জরী' গ্রন্থের প্রণেতা। রামভদ্র উদয়নাচার্য্যের 'কুসুমাঞ্জলি কারিকাভাষ্য' লেখেন। মথুরা-নাথের ছাত্র ভবানন্দ। ইনি রঘুনাথের সমকক্ষ জগদীশের গুরু। ভবানন্দ দীধিতির 'মণিদীধিতি' ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ভবানন্দের পুত্র মধুসূদন ও পৌত্র রুদ্ররায় ন্যায় শাস্ত্রের অসাধারণ পন্ডিত ছিলেন। ন্যায় শাস্ত্রের মূল গ্রন্থতুল্য মূল্যবান 'ভাষা পরিচ্ছেদ' ও তার টীকা সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী রচনা করে বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চানন অমর হয়ে আছেন।

স্মৃতি চর্চা

শ্রুতি ও স্মৃতি শব্দ দুইটি একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। শ্রুতি মানে বেদ অপৌরুষেয় অখণ্ড জ্ঞানরাশি আর স্মৃতি মানে ঋষিগণ রচিত বেদানুগ ধর্মশাস্ত্র।

শ্রুতিং পশ্যন্তি মুনয়ঃ।
স্মরন্তি চ তথাস্মৃতিম্।

বৈদিক জ্ঞান ও কর্ম অনুশীলনের ও আচরণের জন্য বেদাঙ্গের চর্চা আবশ্যিক ছিল। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ – এই ছয়খানি বেদাঙ্গের মধ্যে কল্পসূত্র থেকেই শ্রৌত পুত্র ও ধর্মসূত্রের উদ্ভব ও বিস্তার। প্রতিটি বেদের আলাদা আলাদা কল্পসূত্র। কল্পসূত্রের যে অংশে পারমার্থিক ও ঐহিক অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্মের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিধি ও ব্যবহারাদি লিপিবদ্ধ থাকে তাকে বলে ধর্ম-সূত্র। এই ধর্মসূত্রগুলি-ই স্মৃতি সমূহের মূল ভিত্তি।

ধর্মশাস্ত্র ও সংহিতা স্মৃতি শাস্ত্রের নামান্তর। "শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।" ধর্মশাস্ত্রকারগণের সংখ্যা অনেক। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা কুড়ি জন মুখ্য ধর্মশাস্ত্রকারের নাম দিয়েছেন –

"মন্বত্রি-বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী ॥
পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিতা দক্ষ গৌতমী।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১।৪৩)

এদের মধ্যে আবার মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, পরাশর সংহিতা প্রভৃতি মুখ্য। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধান মনুসংহিতা বা মানবীয় ধর্মশাস্ত্র। মনুর নাম ঋগ্বেদে এবং ব্রাহ্মণাদিতেও দেখা যায়। মনুসংহিতার কাল নিয়ে মতভেদ আছে – খৃষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতক থেকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়

নিরূপণ করেছেন বিভিন্ন ইউরোপীয় পন্ডিত। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ বর্জনের সূত্রে পরবর্ত্তী সংকলন বা পুথিলেখকগণের শ্লোকসংখ্যার, কখনো বা বিষয়ের ন্যূনাধিক্য ও অভিনবত্ব। তাহলেও উত্তরকালের সকল ধর্মশাস্ত্রকারগণই মনুকে সর্বদা ও সর্বথা মান্য দিয়েছেন। মনুসংহিতায় অনেকগুলি টীকাও রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে মেধাতিথির টীকাই প্রাচীনতম। তাছাড়া গোবিন্দরাজ, ধরণীধর, রাঘবানন্দ প্রভৃতি অনেকের নাম পাওয়া যায়। তবে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় টীকা করেছেন ত্রয়োদশ শতকে বারাণসী-ধামের কুল্লুক ভট্ট, টীকার নাম — মন্বর্থ মুক্তাবলী।

বঙ্গদেশীয় স্মৃতিশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে একটি প্রাচীন নাম ভবদেব ভট্ট (১০৭০-১১৭১)। তিনি ছিলেন বিক্রমপুরের (পূর্ববঙ্গ) হরিবর্মদেবের মন্ত্রী এবং ব্যবহার বিবেক, প্রায়শ্চিত্ত বিবেকাদি গ্রন্থের প্রণেতা। প্রায় সমকালেই আবির্ভূত হন অন্যতম প্রাচীন তথা প্রবর্ত্তক স্মার্ত্ত জীমূতবাহন। তাঁর দায়ভাগ বিখ্যাত গ্রন্থ। জীমূতবাহন আত্মপরিচয়ে লিখেছেন —

পারিভাদ্র কুলোদ্ভূতঃ শ্রীমান জীমূতবাহনঃ।
দায়ভাগং চকারেয়ং বিদুষাং সংশয়চ্ছিদে॥

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অজয় নদের তীরে এই পারিগ্রাম। এ.ডু. মিশ্র রচিত কুলকারিকা গ্রন্থানুসারে জীমূতবাহন ভট্টনারায়ণের সপ্তম উত্তর পুরুষ। ভট্টনারায়ণ বঙ্গদেশে আসেন (১১১ সম্বৎ) ১৪২ খ্রীষ্টাব্দে। কাজেই একাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে জীমূতবাহন বর্ত্তমানে ছিলেন। জীমূতবাহনের দায়ভাগের কয়েকখানি টীকা আছে। টীকাকারদের মধ্যে শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, অচ্যুত চক্রবর্ত্তী প্রমুখ প্রধান।

ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহন ছাড়া বঙ্গীয় স্মৃতিকারদের মধ্যে মধ্যযুগে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি নাম হলায়ুধ, শূলপানি, অনিরুদ্ধ ভট্ট, গোবিন্দানন্দ ও স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' প্রণেতা। শূলপাণির বিখ্যাত গ্রন্থ স্মৃতি বিবেক, শ্রাদ্ধ বিবেক, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক। অনিরুদ্ধ ভট্ট বল্লাল সেনের

গুরু ও মন্ত্রী ছিলেন । তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ – হায়ুলতা । গোবিন্দানন্দ বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী । পিতার নাম গণপতি ভট্ট । তাঁর রচিত স্মৃতিগ্রন্থ – বর্ষক্রিয়া কৌমুদী, দানক্রিয়া কৌমুদী, শ্রাদ্ধক্রিয়া কৌমুদী, শুদ্ধি কৌমুদী ও ক্রিয়া কৌমুদী এই পাঁচখণ্ডে বিভক্ত । তিনি রঘুনন্দনের সমসাময়িক ।

রঘুনন্দনের পিতার নাম হরিহর ভট্টাচার্য । শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালে তিনি নবদ্বীপে স্মৃতি শাস্ত্রের তথা নব্যস্মৃতি আলোচনা করে প্রসিদ্ধ হন । তিনি অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব রচনা করেছেন এবং সর্বত্র জীমূতবাহনের অনুসরণ করে তাঁর অনুক্ত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত রচনা করে স্মার্ত শিরোমণি খ্যাতি লাভ করেন । রঘুনন্দনের দায়তত্ত্বের একটি সুন্দর টীকা রচনা করেছেন কাশীরাম বাচস্পতি ।

তন্ত্রচর্চা

তন্ত্র শব্দটির অনেক অর্থ । সুতন্ত্র, গণতন্ত্র, পঞ্চতন্ত্র, মহানির্বাণ তন্ত্র – সবক্ষেত্রে তন্ত্রের অর্থ এক নয় । বিস্তারার্থক তন্ ধাতুযোগ, শব্দটি নিষ্পন্ন । তন্ত্র-শাস্ত্র অর্থে বলা হয়েছে —

'তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানমনেন ইতি তন্ত্রম্ ।'

কালিকাগমের মতে —

তনোতি বিপুলানর্থান্ তন্ত্রমন্ত্র সমন্বিতান ।
ত্রাণং চ কুরুতে যস্মাৎ তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥

তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব নিয়ে মতভেদ আছে । তবে তন্ত্রও বেদতুল্য মান্য । "বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা কীর্ত্তিতা শ্রুতিঃ ।" শ্রুতি দুই প্রকার । বৈদিকী ও তান্ত্রিকী । তন্ত্রের মুখ্য বিভাগ দুইটি – নিগম ও আগম ।
দেবী যখন বলেন, শোনেন শিব, তখন তা নিগম, আর শিব যখন বলেন শোনেন শিবা – তা আগম ।

নির্গতং গিরিজা বক্ত্রাদ্ গতং শিব মুখেষু যৎ ।
মতং শ্রী বাসুদেবস্য নিগমস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥

প্রতিমার অভাবে ঘটে ধ্যানমূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে পূজা করা হয়। ধ্যানমন্ত্রের মধ্যে দেবতার রূপটি প্রথম মূর্ত্ত হয় পূজকের হৃদয়ে – তারপর যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত প্রাণ প্রতিমায় তাঁকে স্থাপন ও আবাহন করে বাহ্যপূজান্তে আবার পূজকের হৃদয়ে প্রত্যাকৃত বা বিসর্জিত হয়। তন্ত্রমতে মন্ত্রময় যন্ত্র দেবতার নিত্যাধিষ্ঠান ক্ষেত্র। কুলার্ণব তন্ত্র বলেন —

"দেবস্য যন্ত্ররূপস্য যন্ত্রব্যাপ্তিমজানতাম্।
কৃতার্চনাদিকং সর্বং ব্যর্থং ভবতি শাম্ভবি॥

বলা বাহুল্য যে, প্রতিমাটি – আরাধ্য দেবতা নয়। প্রস্তর, মৃৎ, ধাতু, দারু ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত বিগ্রহে ধ্যেয় দেবতার রূপ মাত্র। ভক্তি ও আবেগের অবলম্বন রূপে প্রতিমার মধ্যে, মানুষ ধ্যানমূর্ত্তির রূপের মধ্যে একটি বিচিত্র ভাবরসের আস্বাদন পায়। শাক্ত তন্ত্রমতে মহাবিদ্যার প্রথম রূপটি কালী। সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাবাশ্রয়ী কোন প্রতিমা ছিল না কালিকার। মাতৃমন্ত্রী সাধক ভাবুক কৃষ্ণানন্দ যেন তৃপ্ত হচ্ছিলেন না। বিশেষতঃ যন্ত্রার্চনার মধ্যে যে রস তা গূঢ় ও গভীর কেবল উচ্চস্তরের সাধকের হৃদয়বেদ্য। তাই একটি সর্বজনগ্রাহ্য মাতৃমূর্ত্তির জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন তিনি। দক্ষিণা কালিকার ধ্যানানুগ মূর্ত্তির মধ্যে যে গভীর রহস্য আছে "মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাম্" – অবস্থানের মধ্যে বা তত্ত্বের তাৎপর্য্যপূর্ণ ইশারা আছে – তা অনভিষিক্ত অদীক্ষিত মানুষ ঠিক ধারণা করতে পারে না। অধিকন্তু বিকৃত ধারণার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। তাই হৃদয়ে আকুল প্রার্থনা নিয়ে কৃষ্ণানন্দ মাকে ডেকে চলেছেন – "মা কিরূপে পূজা নেবে তুমি তা দেখিয়ে দাও – কেবল যন্ত্রে নয়, মূর্ত্তিতে পূজা করতে চায় মন। রূপটি প্রত্যক্ষ করাও।" কেবল পূজার আসনে বসে নয় – চলনে-অশনে-শয়নে-স্বপনে – একই প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে গেলেন সাধক। প্রসন্ন হলেন মাতা। প্রত্যাদেশ দিলেন – কৃষ্ণানন্দ কাল ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যে নারীমূর্ত্তি প্রথম দর্শন করবে তুমি, তাঁর রূপ ও ভঙ্গীর মধ্যে থাকবে আমার মূর্ত্তির ইঙ্গিত।

পরদিন যথাকালে গঙ্গাস্নানে চললেন কৃষ্ণানন্দ। কিছদূর অগ্রসর হতেই চোখে পড়ল এক শ্যামাঙ্গিনী আলুনিতকুন্তলা গোপনারী স্বল্পবাসা যুবতী ডান হাতে একতাল

গোবর নিয়ে ঘুটে দেবার জন্য উদ্যত । বাম হস্ত প্রসারিত । এক চরণ কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে স্থিত । কৃষ্ণানন্দের চোখ পড়ায় লজ্জায় জিভ কাটলেন তরুণী । বিদ্যুৎ চমকের মত তাঁর মনে মূর্ত্তি কল্পনা উদ্ভাসিত হল । চতুর্ভুজা শ্যামা মূর্ত্তি বা প্রতিমা যেটি আজও মন্দিরে মন্দিরে পূজিতা — সেই মূর্ত্তিটি প্রথম তৈরী করলেন কৃষ্ণানন্দ । তারপর সংকলন করলেন বিখ্যাত গ্রন্থ তন্ত্রসার । তন্ত্রের তাত্ত্বিক ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি সম্বন্ধে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সূত্রে লিখলেন —

নত্বা কৃষ্ণপদদ্বয়ং ব্রহ্মাদি সুর বন্দিতম্ ।
গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং কৃষ্ণানন্দেন ধীমতা ॥

নবদ্বীপে আগমেশ্বরীতলা এখনও পুণ্যস্মৃতিবাহী একটি জাগ্রত পীঠস্থান ।

কৃষ্ণানন্দের পুত্র হরিনাথ । হরিনাথের দুই পুত্র গোপাল ও মধুসূদন । তাঁরাও বহু তন্ত্রগ্রন্থ প্রণেতা । গোপালের তন্ত্রদীপিকা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ।

বিদ্যাচর্চা

এইসকল পন্ডিতগণের প্রায় সকলেই সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাতিলাভ করেছিলেন । তখনকার বিদ্যার্থীরাও সঙ্ঘবদ্ধভাবে নবদ্বীপের টোলে এসে একত্রিত হতেন । ফলে মিথিলার একাধিপত্য ম্লান হয়ে ক্রমে নবদ্বীপ বহুগুণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল । কথিত আছে, ঘরে ঘরে বিদ্যাভ্যাসরূপ প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠত নবদ্বীপ ধাম । আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই বিদ্যালাভে উদ্বুদ্ধ হতেন । সকলেরই যেন একই ভাব । বিদ্যার্জনই যেন জীবনের প্রধান সাধন । যে ব্যক্তি পন্ডিত, সেই কুলীন, সুখী এবং তাঁর জীবনই সার্থক -- এটাই ছিল তখনকার নবদ্বীপবাসীর মুখ্য ভাবনা । পিতামাতারও একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সন্তানকে পন্ডিত করতে হবে । সেজন্য পাঁচ বৎসর সময় হতেই বিদ্যাভ্যাস শুরু হত । কন্যাসন্তানের পিতামাতারা পন্ডিত জামাতাকে কন্যা সম্প্রদান করতে আগ্রহী হতেন । পন্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষকতার নিমিত্ত ধনী সম্প্রদায়ও অর্থ ব্যয় করতেন । বিদ্বান ব্যক্তির সম্মানার্থে পথচারী এক পাশ করে দাঁড়াতেন । এমন কি স্ত্রীলোকেরা স্নানঘাটে শাস্ত্রচর্চা করছেন, বালকেরা স্থানে স্থানে বিদ্যাযুদ্ধ করছে । মোটকথা এক বিস্ময়কর বিদ্যাচর্চা পরিবেশে সেদিনের নবদ্বীপ পূর্ব ভারতের পীঠস্থান ছিল ।

নবদ্বীপের প্রত্যেক গলিতেই টোল । চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ যখন পরস্পর পথে চলতেন তখন তাঁরা আর কোন দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে তর্কের মীমাংসায় ব্যস্ত থাকতেন, দিবাভাগে ছাত্রগণ জাহ্নবীর জলে স্নান করতে গিয়ে গাত্র মার্জনের দিকে অধিক দৃষ্টি না দিয়ে, চিত্তের উৎকর্ষ সাধনের দিকেই অধিকতর মনোনিবেশ করতেন। তাঁরা ন্যায় শাস্ত্রের কোন এক প্রশ্ন উত্থাপন করে, তদ্বিষয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতেন। স্রোতস্বিনীর বক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁরা এইরূপে অধিকাংশ সময় যাপন করতেন । সময়ে সময়ে তাঁদের তর্কযুদ্ধ এত ঘোরতর হয়ে দাঁড়াত যে, পরস্পরের মধ্যে কেবল রসনার বিচারেই তার পরিসমাপ্তি না হয়ে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হয়ে যেত । সত্য নির্ণয়ই ন্যায়-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । সেই সত্য নির্ণয়ের জন্য বিদ্যার্থিগণ ব্যস্ত হয়ে উঠতেন । সংস্কৃত চর্চা ও ন্যায় শাস্ত্রের প্রধানতম ক্ষেত্র বলে বঙ্গদেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে চারিদিকে নবদ্বীপ বিখ্যাত হয়ে গেল । নবদ্বীপে বহুতর লোকের বাসাবাড়ী ছিল । কেউ কেউ পুত্রকে অধ্যয়ন করাবার নিমিত্ত এবং কেউ কেউ বা বিদ্যাচর্চা করতে বা বিদ্যা দ্বন্দ্ব আস্বাদন করতে নবদ্বীপে বাস করতেন, আবার কেউ কেউ বিখ্যাত অধ্যাপক-গণকে দর্শন করতেও আসতেন । নবদ্বীপে না পড়লে কারও বিদ্যার সমাপ্তি হত না ।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বাঙালীর সারস্বত সাধনায় নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করেছেন ।

"নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে ।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥
বিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ ।
সরস্বতী দৃষ্টিতে সভে মহা দক্ষ ॥
সভে 'মহা অধ্যাপক' করি গর্ব্ব ধরে ।
বালকেহো ভট্টাচার্য্য সনে কথা করে ॥
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায় ।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয় ।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥" [৭]

সকলেই মনে করতেন, নবদ্বীপে অধ্যয়ন করলেই বিদ্যারস পাওয়া যায়। অর্থাৎ অধ্যয়নের পূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণজ্ঞান লাভেরও আনন্দ পাওয়া যায়। ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতের অনেক মেধাবী বিদ্যার্থী এদেশের অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ইংলন্ডে গিয়ে অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করতে পারলে বিশেষ গৌরব অনুভব করতেন এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে সকলে তাঁদেরকে বিশেষ শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শনও করতেন। উল্লিখিত বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়, তৎকালীন নবদ্বীপও ছিল বাংলাদেশের অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ। নবদ্বীপের মধ্যেও সর্বত্র বিদ্যাচর্চা হত। তা শুনে সাধারণ লোকও অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারত। এই কারণে বালকেরাও অধ্যাপকের সঙ্গেও তর্ক-বিতর্ক করত। বিদ্যাচর্চার এইরূপ ব্যাপকতা এবং বিদ্যা ও বিদ্বান সম্বন্ধে এমন সহজাত সশ্রদ্ধচিত্ততা অতি বিরল সামাজিক পরিস্থিতি। যদি কোন দেশে কেউ পন্ডিত হতেন, তবে তিনি নবদ্বীপে পরীক্ষা দিতে বা দম্ভ করে জয়লাভ করতে আসতেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই তথ্য তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন —

"জম্বুদ্বীপে যত আছে পন্ডিতের স্থানে।
সভা জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখানে॥"[৮]

দিগ্বিজয়ী পন্ডিতগণ শাস্ত্রযুদ্ধে অন্যান্য স্থানের পন্ডিতদিগকে পরাজিত করেও, নবদ্বীপের পন্ডিতগণকে পরাজিত না করতে পারলে যেন বিশেষ গৌরব অনুভব করতেন না।

এইরকম বিদ্যাদ্বন্দ্বের একটি চমৎকার চিত্র পাওয়া যায় নবদ্বীপে দিগ্বিজয়ী জয় প্রসঙ্গে। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদিখন্ডের নবম অধ্যায় এবং কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গটি বর্ণনা করেছেন। তরুণ নিমাই পন্ডিত তখন বিদ্যারসে মগ্ন। এ হেন কালে নবদ্বীপে এলেন এক দিগ্বিজয়ী পন্ডিত শাস্ত্রযুদ্ধ ঘোষণা করে।

"এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি।
সর্বত্র জিনিঞা বুলে জয়পত্র ধরি॥
হস্তি ঘোড়া দোলা লোক অনেক সংহতি।
সম্প্রতি আসিয়া হৈল নবদ্বীপে স্থিতি॥
নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।
লয়ে জয়পত্র মাগে সকলি সভায়॥"[৯]

এই প্রতিস্পর্ধা শুনে নবদ্বীপের বাঘা বাঘা পন্ডিতরা ভয় পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। দিগ্বিজয়ী এসে পড়লেন গঙ্গাতীরে যেখানে নিমাই পন্ডিত বসেছিলেন ছাত্রদের নিয়ে

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসি আছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তথাই আইলা।
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা ॥
সোইলা তাঁরে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ॥
ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পন্ডিত তোমার নাম।
বাল্য শাস্ত্রে তোমার কহে গুণ গ্রাম ॥
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥[১০]

(শ্রীল কৃ·দা·ক|চৈ·চ·|আদি|১৬)

এই আরম্ভ। নিমাই বিনীতভাবে দিগ্বিজয়ীর প্রশস্তি করে গঙ্গার স্তব করতে বললেন। তৎক্ষণাৎ শ্লোক রচনা করে ঝড়ের মতো বলে গেলেন — কাশ্মিরী পন্ডিত। নিমাই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। দোষ বিচার করতে বললেন। ক্ষিপ্ত হলেন পন্ডিত — তাঁর কাব্যে দোষ? নিমাই তখন এক এক করে শ্লোকের দোষগুলি দেখালেন ব্যাখ্যা করে —

শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী পন্ডিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত ॥ (ঐ)

কেবল ন্যায়-ব্যাকরণ-স্মৃতি বেদান্ত আদি শাস্ত্র নয়, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রাদিরও চর্চা হতো। জ্যোতিষ ও বৈদ্য শাস্ত্রেরও অনুশীলন হতো। এই প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সতীর্থ বৈদ্য মুরারি গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –

"সটিক ব্যাস বৈ কাব্য অলঙ্কার
নাট-তর্ক সাহিত্যে ।
না দেখে না শুনে সে শাস্ত্র বাখ্যানে
সভে মোহে কবিত্বে ॥" [১১]

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তৎকালীন নবদ্বীপের বৈভব-কথন প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন —

"রমা দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে ।" [১২]

অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টিপাতে সকলেই সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতেন । অন্নবস্ত্রের দুঃখ কারও ছিল না । পুত্র কন্যার বিবাহে এবং উৎসবাদিতে লোকেরা ইচ্ছানুরূপ অর্থব্যয়ও করতেন এবং তাঁদের সেই সামর্থ্যও ছিল । যথেচ্ছ অর্থব্যয়ের দম্ভ প্রকাশের অন্যতর উপলক্ষ্য ছিল নানা লৌকিকতার বাহ্যাড়ম্বর । মনসা আদি দেবতার পূজোপলক্ষে যেমন হতো – তেমনি হতো পুতুলের এমন কি কুকুর বিড়ালের বিবাহাদি ব্যাপারে, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হতো ।

শুধু নবদ্বীপে নয়, সাধারণতঃ বঙ্গদেশের মানুষেরও বিদ্যাপ্রীতি ও আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল । শ্রীগৌরাঙ্গদেব একবার পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে বহু বিদ্যার্থী তাঁর নিকট বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে তাঁরা যেভাবে তাঁকে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন, তাও শ্রীল বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন —

"তবে প্রভু গৃহে আসিবেন হেন শুনি ।
যার যেন শক্তি সভে দিলা ধন আনি ॥
সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র দিব্যাসন ।
সুরঙ্গ কম্বল, বহু প্রকার বসন ॥

উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে ।
সভেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে ॥" [১২]

যথাশক্তি এবং সন্তুষ্ট চিত্তে যাঁরা সুবর্ণ রজতাদি নিজেদের গৃহ থেকে দান করে দিতে সমর্থ, তাঁদের যে আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায় ।

তৎকালীন জমিদারগণও জ্ঞানী, পন্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহীদের জন্য সানন্দে অর্থব্যয় করতেন । ষোড়শ শতাব্দীতে পাঠান রাজত্বের শেষভাগে বুদ্ধিমন্ত খাঁন নবদ্বীপের অধিপতি ছিলেন । তিনি নবাবের অধীনে শাসন কর্তৃপদে স্থিত ছিলেন । তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল । বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা শ্রীসনাতন মিশ্র বুদ্ধিমন্ত খাঁনের রাজসভার পন্ডিত ছিলেন । বুদ্ধিমন্ত খাঁনের অত্যাগ্রহে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর বিবাহ রাজোচিত মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছিল । বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই বহন করেছিলেন । শুধু তাই নয়, আচার্য্য চন্দ্রশেখরের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রথম যখন নৃত্য-নাট্যের আসর বসালেন তখন সেই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ আয়োজন বুদ্ধিমন্ত খাঁন নিজেই সম্পন্ন করেন ।

জয়ানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দুই বিবাহেই যে রাজোচিত মহাসমারোহের বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে লক্ষ্মীদেবীর পিতা বল্লভাচার্য্য এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা সনাতন পন্ডিতকে দরিদ্র বলা চলে না । শ্রীগৌরাঙ্গদেবও নিজ বিবাহে – "ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিন কান্চন রজতে ।" [১৩]

তবে, শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের মতে এবং কবি লোচনদাসের মতে লক্ষ্মীদেবীর পিতা বল্লভাচার্য ছিলেন নির্ধন । শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই, শ্রীবল্লভাচার্য বলছেন --

"আমি যে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাই ।
কন্যা মাত্র দিব পন্চ হরিতকী দিয়া ॥" [১৪]

লোচনদাস ঠাকুর লিখেছেন –

"আমি ধনহীন কিছু দিবারে না পারি ।
কন্যা একমাত্র মোর আছএ সুন্দরী ॥" [১৫]

বল্লভ মিশ্র কন্যাকে আশীর্বাদ করে বলেছেন –

"ধনহীন আমি ছার – নাহি করি ভাগ্য ।
কি দিব তোমারে দান কিবা তোর যোগ্য ।।" [১৫]

যা হোক বল্লভাচার্য নির্ধন ছিলেন কিনা সে বিচার স্বতন্ত্র । কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে পর্যাপ্ত স্বচ্ছলতা ছিল তা বুঝা যায় । অবশ্য একথার তাৎপর্য নিশ্চয় এমন সিদ্ধান্ত এই নয় যে, সেকালে নবদ্বীপে বা বঙ্গদেশে দরিদ্র মানুষ ছিল না । তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বচ্ছল মানুষের অভাব ছিল না এবং তাঁরা অকাতরে নানা উপলক্ষ্যে অর্থ ব্যয় করতেন ।

ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণও অনেকেই দরিদ্র ছিলেন । সজ্জনগণের আনুকূল্যে তাঁদের দুঃখ দারিদ্র্য লাঘব হত । তৎকালীন ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা দরিদ্র হয়েও কিরূপ নির্লোভ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণীরাও কিরূপ উদার স্বভাবা ছিলেন নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায় । পন্ডিত কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যের স্ত্রীকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাণী গঙ্গার ঘাটে দেখেন, তথায় একটি ঘটনা ঘটে ।

"রাণী তাঁহার স্বামী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বলেন, তুমি নাকি নবদ্বীপের পন্ডিতদের খুব দান কর । গঙ্গার ঘাটে এক পন্ডিত গৃহিণীকে দেখিলাম গায়ে একরতি সোনা নাই, শাঁখা পর্য্যন্ত নাই, একটি লাল সূতা বাঁধা, তাঁহাদের কিছু দান কর । রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পন্ডিতের বাড়ী আসিয়া এক হাজার টাকা তাঁহাকে দিতে চাহিলেন । পন্ডিত দান নিতে অস্বীকার করিলেন । ব্রাহ্মণী বলিলেন, দাঁড়ান আমার টাকা রাখার জায়গা নাই । জায়গা আনিতেছি । পন্ডিত নিজ পত্নীর ধনলোভ দেখিয়া ক্ষুন্ন হইলেন । অল্পসময় মধ্যে ব্রাহ্মণী দরিদ্র পল্লীতে গিয়া সংবাদ দিলেন ও বহু লোক ডাকিয়া আনিলেন । ব্রাহ্মণী রাজাকে বলিলেন, এই দরিদ্রগণ আমার জায়গা । রাজা প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া টাকা দেন । এত লোক আসিল যে রাজার টাকা ফুরাইয়া গেল ।" [১৬]

যাঁর বাসস্থান হচ্ছে ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছাদিত কুটীর, অভাবের তাড়নায় যাঁর দেহ শীর্ণ-ক্ষীণ, হস্তে সোনা তো দূরের কথা শাঁখাও নেই - কেবল লাল সূতা মাত্র যাঁর আভরণ, সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীর উচ্চ হৃদয় এবং বিশাল উদারতা বিস্ময়কর নয় কি ? তৎকালে এই ছিল ব্রাহ্মণের আদর্শ - নির্লোভতা ।

111506
16 DEC 1994

ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা শুধু নির্লোভই ছিলেন না, তাঁরা যে নির্ভীক, স্পষ্টবাদী ও রসজ্ঞ ছিলেন — এই দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে অবতাররূপে স্বীকার করতেন না। একদিন অদ্বৈত বংশীয় পরম বৈষ্ণব পন্ডিত রাধামোহন গোস্বামীর সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হয় । গোস্বামীজীকে রাজা বলেন, "আমি অনেক শাস্ত্রালাভ করিয়া বুঝিয়াছি মহাপ্রভু অবতার নহেন । আপনি কি মনে করেন ? শ্রীরাধামোহন কহিলেন, ঐ সম্বন্ধে আমারও সন্দেহ ছিল, আজ দূর হইল । যখন ভগবান অবতার হন তখন একজন রাজাকে তাঁহার বিরোধী দেখিতে পাওয়া যায় । চৈতন্য অবতারে ঐরূপ কোন রাজাকে দেখি নাই, আজ আপনাকে পাইলাম । আমার সকল সন্দেহ দূর হইল । এই স্পষ্টবাদিতা ও শ্লেষপূর্ণ রসিকতা তুলনাহীন ।"[১৬]

জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে অর্থনৈতিক ব্যাপারে কিছু সংবাদ প্রকাশ করেছেন । তিনি লিখেছেন যে, বারাণসী ত্রিহূত, উড়িষ্যা কাশ্মীর ও ভোটদেশ (তিব্বত) থেকে সেই সময়ে বাংলার বাসন, তালা, ফুর, কম্বল প্রভৃতি আসত । তিনি অলঙ্কার পোষাক ও বাজনার তালিকাও দিয়েছেন —

"ডাবর বাটা গুবাক সম্পুট
দর্পণ রসবাটিকা ।
তাম্রহান্ডি রস পিতল কলস
বারাণসীর ত্রিপদীকা ॥
শঙ্খ বাটাবাটি সরঙ্গি খান
রসম-ত্র সব খুরি ।
তিরোহিত গাড়ু তাম্র সুখারসম-ডল
শীতল পিওল ঝরি ॥"[১৭]

সোনার মাদুলি, কোমরের গয়না, সোনার অলংকার, হার ও পায়ের গয়না,' সোনার কাঠি' ও বাচ্চাদের ছেলে ভুলনো খেলনা প্রধান ছিল । সোনার নূপুর, মাদুলি, বালা, কেয়ুর ও কঙ্কন এদেশেই তৈরী হত । নবদ্বীপের হাটে 'ভুবনদুর্লভ' সকল বস্তু বিক্রী হত ।

হুসেন শাহী শাসকগণ কিছু রূপোর মুদ্রা এবং কিছু স্বর্ণমুদ্রা চালু করেছিলেন ।

"গৌড় ও পূর্ব বাংলার ধনীসমাজের ঐশ্বর্য্যের কথা 'তারিখ-ই-ফিরিস্তি' ও 'রিয়াজ-উস-সালাতিনে'-ও উল্লিখিত আছে, গৌড় ও পূর্ব বাঙলার ধনী লোকগণ সোনার থালা বাটীতে আহার করে ।" ১৮

১৪১৫ খ্রী: 'মেইসিন' নামে এক চীনা পর্য্যটক বাংলায় আসেন । তিনি বলেছেন, "এখানকার মাটি উর্ব্বর এবং তাতে প্রচুর ফসল ফলে ; বছরে দুবার ধান পাকে ।" ১৯ সেই সময় খাদ্যদ্রব্যও এত সস্তা ছিল যে সবচেয়ে কম মূল্যের বিনিময় মাধ্যম দ্বারা জনগণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করত । রাজকর্মচারী, রাজপন্ডিত, বণিক সম্প্রদায় কর্তৃক যাহা কিছু সঞ্চিত হত, বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ঐ সঞ্চিত অর্থই ব্যয় হয়ে সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের হাতে পৌছাত । জীবন-ধারণের উপায়স্বরূপ মধ্যবিত্তগণ কৃষি এবং নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় দৈনিক মজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসাকেই আশ্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করত ।

উল্লেখ্য, তৎকালীন অর্থনীতি ও এর বন্টন ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক প্রথা নির্ভর ।

পন্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড় বাঙলার রাজধানী লক্ষ্মণাবতী । বর্ত্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত । হুসেন শাহ একজন বিদ্যোৎসাহী গুণবান শাসক ছিলেন । এ বিষয়ে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পর্যাপ্ত ।

"বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে হুসেন শাহ যা ভেবেছিলেন তা অতীব প্রশংসনীয় । এ ছাড়া, তিনি বহু লোকহিতকর কার্য্যও – হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রত্যেক জেলায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।" ২০

"He built public mosques and Hospitals in every District, and settled pensions on the learned and devout, he settled a grant of lands for the support of the tomb, college and hospital..." ২১

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, "হুসেন শাহের রাজত্বে দেখিতে পাই ... তিনি অভিজাত বংশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও হিন্দুদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়েই, অনুমান হয়, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ হুসেন শাহ কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণে আমন্ত্রিত হন। এবং তাঁহারা ইহা গ্রহণ করেন। সনাতনকে 'দবীর খাস' উপাধি দেওয়া হয়। দবীর-খাস্ অর্থ বিশ্বস্ত খাস মুন্সী। (প্রাইভেট সেক্রেটারী)। পরে তিনি প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। শুধু রূপসনাতন নহেন, আরও অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে হুসেন শাহ রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুরন্দর খানকে উজিরী দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম গোপীনাথ বসু। তাঁহার প্রধান চিকিৎসক — মুকুন্দ দাস। তাঁহার দেহরক্ষীদের প্রধান — কেশব শত্রী। টাঁকশালের অধ্যক্ষ - অনুপ। দ্বিতীয় ত্রিপুরা যুদ্ধে গৌড় মল্লিক প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই হিন্দু ছিলেন। এই ক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের সহিত হুসেন শাহকে নিঃসন্দেহে তুলনা করা যাইতে পারে।" [২২]

স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "In appointing Hindus to high offices .... to put them in charge of highly confidential work was certainly something more than mere diplomatic expediency. His Wazir (Gopinath Basu, entitled Purandar Khan), his private physician (Mukunda Das), his chief of the body-guards (Keshab Chhatri), Master of the Mint (Anup) - were all Hindus ; the Rajmala adds the name Gaur Mallik, his general in charge of the Second Tipperah Expedition. The name of the two brothers Rup and Sanatan, one of whom held the highly important office of the private Secretary (Dabir-i-khas) are well known." [২৩]

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের সামাজিক কলেবর এক নিদারুণ বিশৃঙ্খলা, আমীর ওমরাহের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, নবাব বাদশাহদের যুদ্ধবিগ্রহ গ্লানিকর ষড়যন্ত্র এবং বাঙালী সমাজের অদৃষ্টনির্ভর নির্বিকার ভাব — এই নানাপ্রকার ক্ষত বিক্ষত হয়ে সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থায়ই পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল।

শ্রীকবি কর্ণপুর, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এই সময়ের যে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করেছেন তার থেকে জানা যায় যে, সমাজের মধ্যে তখন কলির 'ভবিষ্য-আচার' প্রবেশ করেছিল ।

ধর্ম ও সংস্কৃতি পরিস্থিতি

মুসলমান আমলে গৌড় ছিল বাঙলার রাজনৈতিক রাজধানী । কিন্তু বাঙলার সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে গেল নবদ্বীপই । তুর্কী আক্রমণের প্রচন্ড আঘাত সমগ্র বাঙলার হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজকে বিপর্য্যস্ত করেছিল । পরবর্ত্তীকালে মুসলমান সমাজ আরও শক্তি-শালী হল । ফলে নগরবাসী লক্ষ্মীদেবীর শুভদৃষ্টির মধ্যে বাস করেও তাঁরা সর্বদাই ভয়, অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতেন । রাজ্যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রকটিত হলেও ধনৈশ্বর্য্যের অভাব নাই । শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, শাস্ত্রচর্চা প্রচুর । বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র নবদ্বীপে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী চতুর্দিক থেকে সমাগত হয়ে চুলচেরা ন্যায়ের বিচারসভা বসিয়েছে । নব্য ন্যায়ের শুষ্ক তর্কে গঙ্গাতট মুখরিত । কিন্তু এত থাকতেও মানুষ নাই । মানুষে মানুষে মিলন নাই । শিক্ষিত অশিক্ষিতকে, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণকে, এবং ধনী ব্যক্তি নির্ধনকে ঘৃণা করে । পন্ডিতগণের মুখে উচ্চারিত হয় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মন্ত্র, কিন্তু কখন কার স্পর্শে অপবিত্র হয়ে যাবে এই ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত চরণ বিক্ষেপে পথ চলে । সেদিনের সমাজে পান্ডিত্যের সুগভীর চর্চা ছিল, বিচারে ছিল 'ব্রহ্ম একরসং' কিন্তু ব্যবহারে সমাজ শতধা বিভক্ত । বর্ণাশ্রমের দুর্ভেদ্য দেওয়াল, অস্পৃশ্যতার কঠোর গন্ডী মানুষের মধ্যে বিপুল ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল । মানুষের অন্তরের ব্যথা উপলব্ধি করার মত সেদিন একটি মানুষও ছিল না ।

হিন্দু সমাজের সমাজজীবনও যে তখন তান্ত্রিক বিকৃতি, মিথ্যাচার, দুৎমার্গ, অনাচারাদিতে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছিল, একথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে । চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই হিন্দুদের বৈদিক আচার প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, সামান্য যাহা অবশিষ্ট ছিল তা মাত্র কুলীন বা কৌলাচারী ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি । আর বাকী অন্যান্য বর্ণের মধ্যে তন্ত্রধর্মের সঙ্গে বিকৃত বৈষ্ণবধর্মের মিলনে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ সংস্কার চলছিল ।

মমতাজুর রহমান তরফদারের মতে, "মুসলমানদের বাঈজী প্রথা ও হিন্দুদের তন্ত্রাচার মিলিয়া সমাজে ব্যভিচারের রূপ প্রকটাকার ধারণ করিয়াছিল।" [২৪]

এই দুই ধরণের হিন্দুধর্মই তৎকালীন বিধর্মী মুসলমান রাজশক্তির নিকট উপেক্ষিত, অবহেলিত ছিল। কবি জয়ানন্দ মিশ্র তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রটি প্রস্ফুটিত করেছেন —

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শোনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘরদ্বারা লোঠে তারে লৌহপাশে বাঁন্ধে॥
দেউল দেহড়া ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাটি যত।
অশুন্থ পনসবৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকিও প্রমাদ হব পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্ব লিখন আছে ধনুর্ময় প্রজা॥
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।" [২৫]

চতুর্দশ শতকের পূর্ব থেকেই সূত্রপাত হলেও ঐ শতকের বাংলার সামাজিক উচ্চবর্ণের লোকজনের পারিবারিক জীবন মুসলমান রাজশক্তির নিকট সর্বদা ভীতিপ্রদ ছিল। এর ফলে বাংলার বহু সাধু সজ্জন ও পন্ডিতবর্গ স্বদেশ ত্যাগ করে বাংলার বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখনই বাসুদেব সার্বভৌম সকলের আগে নবদ্বীপ ত্যাগ করে উড়িষ্যায় চলে গিয়েছিলেন।

"বিশারদ সুত সার্বভৌম ভট্টাচার্য।
সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য ॥" ২৬

কিন্তু সকলের পক্ষে দেশত্যাগ সম্ভব হয়নি। যে সব ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে ছিলেন তাঁদের মধ্যে একদল কৌলিন্য রক্ষা করতে নানা সামাজিক তথা মানবিক সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। মুসলমান শাসকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অত্যাচারে বাধ্য হয়ে মুসলমান সম্পর্কজনিত দোষে পিরালী গ্রন্থ পতিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মানুষরা একদিকে না পেরেছেন বিধর্মী শাসকদের চাপ পুরোটা মেনে নিতে, অপরদিকে ব্যর্থ হয়েছেন নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অগণ্য, অবহেলিত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে। এটি সাধারণ অবস্থা।

তৎকালীন নবদ্বীপে তথা বাংলাদেশে ভক্ত বা বৈষ্ণব যে একেবারেই ছিলেন না তা নয়, তুলনায় তাঁদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য, চট্টগ্রামে পুন্ডরীকে বিদ্যানিধি প্রভৃতি নবদ্বীপে শ্রীবাস পন্ডিত ও তাঁর ভ্রাতাগণ, বাসুদেব সার্বভৌম ঠাকুরের ভ্রাতা বিদ্যা বাচস্পতি, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, খোলাবেচা শ্রীধর, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, জগন্নাথ মিশ্র, পুরন্দর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ নিজেদের সুকার্য্য করতেন এবং ব্রাহ্মণ সমাজকে উদার ভাগবত-ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত করে সমগ্র সমাজের মানুষকে শুচি অশুচির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

"সুকার্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন ॥" ২৭

"হাতে তালি দিয়া সকল ভক্তগণ ।
আপনা আপনি মেলি করয়ে কীর্ত্তন ॥
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি ।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণ নাম দিয়া করতালি ॥" ২৮

তৎকালীন সমাজের সাধারণ মানুষ বিষয় রসেই মত্ত থাকতেন । ধনী সম্প্রদায়ও রাজকর্মচারীগণ নীতিহীন ভোগসর্বস্ব ব্যভিচারকে জীবনের একমাত্র কাম্য মনে করতেন। সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতগণ এবং ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করলেও ভক্তির অভাব ছিল। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বাংলার সমাজ এবং নবদ্বীপ প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –

"কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার ।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম ।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে ।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥" ২৯

জনসাধারণের এই পারমার্থিক দৈন্য দেখে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তগণের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে যেত, তাদের পারমার্থিক কল্যাণের নিমিত্ত তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করতেন —

"শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র করো সভারে প্রসাদ ।" ২৯

তৎকালীন বাংলার জনসাধারণের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কবি কর্ণপূর লিখেছেন –

"ন শৌচং নো সত্যং ন চ শমদমৌ নাপি নিয়মো ।
ন শান্তি র্ন ক্ষান্তিঃ শিবশিব; ন মৈত্রী ন চ দয়া ॥" ৩০

অর্থাৎ শৌচ, সত্য, শম, দম, নিয়ম, শান্তি, ক্ষান্তি (ক্ষমা), মৈত্রী দয়া প্রভৃতি কিছুই নাই । তিনি আরও বলেছেন –

"মন্থে কর্মণি কেবলং কৃতধিয়ঃ সূত্রৈকচিহ্না দ্বিজাঃ
সংজ্ঞামাত্র বিশেষিতা ভুজভৃবো বৈশ্যাশ্চ বৌদ্ধা ইব।
শূদ্রাঃ পন্ডিতমানিনো গুরুতয়া ধর্মোপদেশোৎসুকা
বর্ণানাং গতিরীদৃগেব কালিনা হা হন্ত সম্পাদিতা ॥" ৩০

যাঁরা দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত তাঁদের মধ্যে আশ্রমোচিত গুণ দেখা যেত না। সামাজিক ব্রাহ্মণগণ সূত্রমাত্র চিহ্ন ধারণ করে কেবল দান-গ্রহণ-কার্যে তাঁদের বুদ্ধিকে নিয়োজিত করেছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ প্রজা রক্ষায় অসমর্থ হয়ে কেবল 'রাজা' উপাধি-মাত্র সম্বল করেছিলেন। বৈশ্যগণ বৌদ্ধপ্রায় বা নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন, শূদ্রগণ পন্ডিত-মন্য হয়ে ধর্মোপদেশ দানে উৎসুক হয়েছিলেন। কলির প্রভাবে চারিবর্ণের এরূপ অবস্থা হয়েছিল।

চারিবর্ণের ন্যায় চারি আশ্রমেরও অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। কবি কর্ণপূর তাঁর নাটকে বলেছেন —

"বিবাহযোগ্যত্বাদিহ কতিচিদাদ্যাশ্রমযুজো
গৃহস্থাঃ স্ত্রী-পুত্রোদয়-ভরণমাত্র ব্যসনিনঃ।
অহো বানপ্রস্থাঃ শ্রবণপথমাত্র-প্রণয়িনঃ
পরিব্রাজো বেশৈঃ পরমুপহরন্তে পরিচয়ম্ ॥" ৩০

যাঁরা বিবাহে অসমর্থ ছিলেন তাঁরা নিজেদিগকে 'ব্রহ্মচারী' বলে অভিমান করেছিল, গৃহস্থগণ অন্যান্য আশ্রমীর প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হয়ে নানাপ্রকার অধর্মের সাথে স্ত্রীপুত্রাদির উদর ভরণে ব্যস্ত ছিল। 'বানপ্রস্থ' শব্দটি কেবল নামে মাত্র শ্রবণ পথগতই ছিল। "পন্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ"। — অর্থাৎ পন্চাশ বৎসর বয়সের পর বনে গমন করবে — এই কথা কেবল পুঁথির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর তৎকালীন সন্ন্যাসিগণ সন্ন্যাসীর অভিমান হেতুতেই সীমাবদ্ধ ছিল। লোক সন্ন্যাসের পবিত্র বেষের অপব্যবহার করে এই পবিত্র বেষকে জীবিকার্জনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। পরস্পরের মধ্যে বিদ্যাকুলের অহঙ্কার, বিষয় সুখভোগের প্রতিযোগিতা, মদ্য-মাংস দ্বারা অবৈদিক দেবতাগণের পূজাদি আড়ম্বর সহকারে পালন

করে তারা আত্মগৌরব অনুভব করত । হরিনদী গ্রামের 'দুর্জন ব্রাহ্মণ' (চৈ·ভা·। ১।১৬), পাষণ্ডী প্রধান 'চাপাল-গোপাল' (চৈ·চ·অন্ত্য। ১৭), 'অরিন্দা ব্রাহ্মণ' গোপাল চক্রবর্ত্তী (চৈ·চ·অ· ৩) ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র খান (চৈ·চ·অ: ৩) প্রভৃতি কয়েকজন সমাজনায়কের জীবনচরিত অঙ্কন করে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তদানীন্তন বহির্মুখ বর্ণাশ্রম ও সমাজের অবস্থা দেখিয়েছেন । কবি কর্ণপূরও তাঁর নাটকে লিখেছেন —

"অভ্যাসাদ্ য উপাধি-জাত্যনুমিতি ব্যাপ্ত্যাদিশব্দাবলে —
র্জন্মারভ্য সুদূর-দূর-ভগবদ্বার্ত্তাপ্রসঙ্গা অমী ।
যে যত্রাধিক কল্পনা কুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমা:,
স্বীয়ং কল্পননমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহোতার্কিকা: ॥" [৩০]

উপাধি, জাতি অর্থাৎ ন্যায় শাস্ত্রের পরিভাষা, অনুমিতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রের শব্দসমূহের অভ্যাস অর্থাৎ পুন: পুন: অনুশীলনবশত: এই পন্ডিতগণ ভগবদ্বার্ত্তা প্রসঙ্গ থেকে জন্মাবধি সুদূর প্রান্তে সরে এসেছেন । যে সকল তার্কিক যত বেশী কল্পনাকুশল, তাঁরা তত বেশী বিদ্বত্তম বলে পরিগণিত হতেন । তাঁদের কল্পনাকেই তাঁরা শাস্ত্র বলে মনে করতেন ।

হিন্দু সামাজিক অনাচারের চিত্র ছিল খুব মর্মান্তিক । হিন্দু সম্প্রদায় পূজার নামে বলি, মাংস, মদ, নাচ-গান, বিবাহ বা অন্যান্য উৎসবে মাত্রাতিরিক্ত খরচ আর বিলাস-প্রমাদে মত্ত থাকত । ধর্মাচরণে আন্তরিকতা বা আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন চেষ্টা ছিল না । সুখ স্বাচ্ছন্দ্যাদি লাভের উদ্দেশ্যেই তাঁরা অবৈদিক দেবতাদির পূজা করতেন । বেদবহির্ভূত-তন্ত্রমতাবলম্বী তন্ত্রাচারীদিগের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে নিজেদের সুখ-সম্পদ-বৃদ্ধির আশাতেই তাদের মহিমা কীর্ত্তন করতেন । তাঁদের এই অলৌকিক শক্তি যে পারমার্থিক শক্তি নয়, সাধারণ মানুষ সেটা জানতেন না । যাঁরা কেবল স্নানের সময়ে, "গোবিন্দপুন্ডরীকাক্ষ" প্রভৃতি ভগবন্নাথের উচ্চারণমাত্র করতেন গতানুগতিকভাবে, এই সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রীয় নামের প্রতি তাঁদের মন বা প্রীতি ছিল না। লোকদেখানো বাহ্যিক আড়ম্বরকেই ধর্মাচরণ মনে করতেন । শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

তাঁর শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে লিখেছেন –

"কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্রি কৃষ্ণকীর্ত্তন ।
ইহার উদ্দেশো নাহি জানে কোনজন ॥
ধর্ম-কর্ম লোকসব এইমাত্র জানে ।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি ।
তাও যে পূজেন সেতো মহাদম্ভ করি ॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্যমনে ।
মদ মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে ॥
জোগিপাল-যোগিপাল-মোহীপালের গীত ।
ইহাই শুনিতে সর্বলোক আনন্দিত ॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময় ।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥
কারে বা 'বৈষ্ণব' বলি কিবা সঙ্কীর্ত্তন ।
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা ক্রন্দন ॥
বিষ্ণুমায়াবশে লোক কিছুই না জানে ।
সকল জগত বন্ধ মহাতমোগুণে ॥" ৩১

তৎকালীন হিন্দুসমাজ উচ্চকীর্ত্তনের বিরোধী ছিল । শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপে নিজের ঘরে বসে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করতেন । অজ্ঞতাহেতু তৎকালীন জনগণের কাছে সেই নামকীর্ত্তন অসহনীয় বোধ হত । সমাজ তখন উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্ত্তনকারী বিশ্ব-বন্ধুগণকে বিশ্ববৈরী মনে করে তাঁদের প্রতি নানা প্রকার কটূক্তি করত । হরিনামকীর্ত্তনকারী পারমার্থিক বৈষ্ণবগণ সর্বক্ষণ সমাজের উপহাস ও নির্যাতনের লক্ষ্য হয়ে পড়েছিলেন । কোন কোন ব্যক্তি ভক্তগণের উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের ফলে দেশের দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আশঙ্কা করতেন । বহির্মুখী সমাজের নিকট হরিনামকীর্ত্তন সার্বকালিক কৃত্য বলে পরিগণিত হত না । বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে গতানুগতিক রীতি অনুসারে কোন কোন স্থানে প্রাণহীন হরিনামসঙ্কীর্ত্তন অন্যান্য কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানের মতই

অনুষ্ঠিত হত । —

"কেহ বলে, — একাদশী নিশি জাগরণে ।
করিব গোবিন্দ নাম করি উচ্চারণে ॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ ?
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ সমাজ ॥" ৩১

কবি কর্ণপুরও তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে তৎকালীন ধর্ম-কর্ম-সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করেছেন । সবশেষে লিখেছেন —

" নিরুপাধি বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত কেবল ধ্যান ধারণা নিষ্ঠা শাস্ত্রাভ্যাসের শ্রম, জপ, তপঃ, কর্ম প্রভৃতির কৌশল শিক্ষাদিতে নিপুণতার আধিক্য হইতেছে কেবল জঠর-পিঠরাবর্তপূর্তির নানাবিধ উপায় মাত্র ।" ৩২

শ্রীল কবি কর্ণপুর এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তির মর্ম একই ।

কতিপয় ভক্ত বৈষ্ণব ব্যতীত, জনসাধারণের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন — তার থেকে জানা যায়, সর্পভয় নিবারণের উদ্দেশ্যে বিষহরির বা মনসার পূজাদি, সাংসারিক আপদ বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য মঙ্গলচণ্ডী-বাশুলীর পূজাদি, ধন-পুত্রাদি লাভের জন্য মদ্যমাংস সহযোগে যক্ষ পূজাদির — পারমার্থিক কোনও মূল্যই নাই ।

তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে অনেকে বৎসরের কোনও কোনও নির্দিষ্ট সময়ে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান করতেন, শ্রীচৈতন্যভাগবত থেকে তাই-ই জানা যায় ; কিন্তু মোক্ষকামহেতু কেউ যে কখনও দুর্গার উপাসনা করেছিলেন তা জানা যায় না । উপাসনা নিত্য কর্তব্য । বৎসরের মধ্যে একবার কি দুইবার দুর্গোৎসব এবং সাময়িক শ্রীদুর্গার উপাসনা এক জিনিষ নয় ।

হিন্দু সামাজিক অপচারের আর একটি চিত্রও মর্মান্তিক । সুস্থ নীতিবোধ, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আদর্শ সমাজজীবনে লুপ্ত হয়ে অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপ প্রকটিত হয়েছিল । জয়ানন্দের ভাষায় সকল মানুষ ছিল 'শিশ্নোদর পরায়ণ' । নীতিবোধহীন এই সমাজের পরিচয় কবি জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে ব্যক্ত

করেছেন –

'যা বাপ ছাড়িল পুত্র সুত-গ্রা যুবতী ।
পরদারে রত হইল লঙ্ঘে নিজ সতী ॥
স্নান সন্ধ্যা দেবার্চন ছাড়িল ব্রাহ্মণে ।
শূদ্রের জীবিকা করে ভয় নাঞি মনে ॥
শূদ্রস্ত্রী সঙ্গম করে শূদ্র ভক্ষে রত ।
মৎস মাংসে লোলুপ ব্রাহ্মণ সব যত ॥"[৩৩]

সমাজে তখন 'জোর যার মুলুক তার' অবস্থা । জগাই-মাধাই নামক দুই ব্রাহ্মণ সন্তান ষোড়শ শতাব্দীরই অবদান, তাঁদের 'অনুযোনি' বিচার ছিল না । গোবধ, ব্রহ্মবধ, স্ত্রী বধ ছলে-বলে গুরুপত্নী হরণ, গোমাংস শূকর মাংস, সুরাপান, গর্ভবতীর গর্ভনাশ, শিশুহত্যা ছিল তাঁদের ভূষণ । সুন্দরী নারীগণের গৃহে থাকা নিরাপদ ছিল না । প্রতাপশালীগণ বলপূর্বক তাঁদের ভোগ করিত । হিন্দুসমাজ অত্যাচারীতদিগকে রক্ষা করতে সচেষ্ট না হয়ে সব কিছুকেই অদৃষ্ট ও কর্মফল মনে করে তাদেরকে সমাজ থেকে পতিত করে নিজেদের শুচিতা রক্ষয় ব্যস্ত থাকত । ফলে অনেক ব্রাহ্মণবংশে 'যবনসংস্পর্শ' দোষ ঘটল ।

এছাড়া নারীদের সম্বন্ধে পন্ডিতপ্রবর রঘুনন্দন বেশ কড়া নিয়ম করেছিলেন। পুরুষের বহুবিবাহ স্বীকৃতি লাভ করলেও নারীর সেই স্বাধীনতা ছিল না । এমন কি বিদ্যাভ্যাস করবার অধিকারও ছিল না ।

"সমাজের এই দারিদ্র্য, এই দুঃখ-দৈন্য সম্বন্ধে রাষ্ট্র যথেষ্ট সচেতন ছিল বলিয়া মনে হয় না । অথবা শ্রেণীবিন্যস্ত, ব্যক্তিগত অধিকার নির্ভর, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতন্ত্রভারগ্রস্ত, একান্ত ভূমি ও কৃষিনির্ভর সমাজের ইহাই হয়ত সামাজিক প্রকৃতি ।"[৩৪]

ষোড়শ শতাব্দীতে চোরের উপদ্রবে জনজীবন অস্থির । পথেঘাটে দস্যুভয় ছিল । 'নৃপতি তিলক' হুসেন শাহের রাজত্বকালেও বাংলায় দস্যুভয় ছিল ভয়াবহ ।

তৎকালীন সমাজের ধর্ম - নিয়ম পরিচালনার দায়িত্ব সর্বেসর্বা ব্রাহ্মণ সমাজের উপর ন্যস্ত ছিল । কেউ কোন প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার শাসনের ব্যবস্থা তাঁরাই করতেন । প্রায়শ্চিত্তের বিধিও তাঁরাই বিধান দিতেন । সেই বিধানও ছিল ভয়াবহ ।

একদিকে মুসলমানদের রাজনীতি ও হিন্দুদের শঙ্কর ব্রাহ্মণ্যের তান্ত্রিক শাসন, অপরদিকে কৌলিন্যগর্বী ব্রাহ্মণ সমাজের অকুলীন ও নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবহেলায় যে প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ লাভ করেছিল, সেই চিত্র তৎকালীন কবি প্রেমানন্দ, শ্রীল লক্ষ্মীকান্ত দাস, শ্রীল মুরারি গুপ্ত প্রমুখ সকল মহাজনদের পদাবলীতে পাওয়া যায় ।

"এমন ! কি করে বরণ কুল ।
যেই কুলে কেন জনম হউক না কেবলই ভকতি মূল ॥
কপিকুলে ধন্য বীর হনুমান শ্রীরাম ভকত যাঝ ।
রাক্ষস হৈয়া বিভীষণ বৈসে ঈশ্বর সভার মাঝ ॥
দৈত্যের ঔরসে প্রহ্লাদ জনমি ভুবনে রাখিল যশ ।
বলনা কি কুল বিদুরের ছিল খাইল যাহার ঘরে ॥
দেখনা কেমন সাধনা করিল গোকুলে গোপের নারী ।
জাতি কুলাচারে তবে কি করিল সে হরি যে ভজে তারি ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সবে অধিকারী কুলের গরব নাই ।
কহে প্রেমানন্দ যে করে গরব নিতান্ত মুরখ ভাই ॥" ৩৫

কবি অনন্তদাস গেয়েছেন —

"মনে অনুমান করি ছাড়িতে নারিনু হরি
তিলাঞ্জলি দিনু কুল লাজে ॥" ৩৫

অথবা — "জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল ।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥
কুলবতী সতী হৈয়া দুকুলে দিনু দুখ ।
জ্ঞানদাস কহে দৃঢ় করি যান বুক ॥" ৩৫

এই সকল পদাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, উপাস্যের লীলা প্রসঙ্গের মধ্যে সর্বত্রই কুলের প্রতি, জাতির প্রতি অবহেলিত ভাব প্রকাশ। কিন্তু জাতিকুলের মধ্যে উপাসনা রহস্যটিকে উদ্ঘাটকের ভিতরেও এক বিশেষ সংস্কারসম্পন্ন মনের রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে।

পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবন, ধর্মীয় জীবন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, তখন প্রেমহীন, মানবিকতাহীন ভোগসর্বস্ব লালসা পঙ্কিল এক অধঃপতনের ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

"একদিকে উত্তর ভারতের অধিকাংশ যখন মুসলমানদের করতলগত, উত্তর গাঙ্গেয় ভারতে যখন রাষ্ট্রীয় অবস্থা প্রায় নৈরাজ্য বলিলেই চলে, তখন বাংলাদেশের রাজ্য ও সমাজ ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন, স্তরে উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় বিভক্ত; রাজসভা চরিত্রও আত্মশক্তিহীন, ধর্ম ও সমাজ বিলাস লীলায় ও যৌনাতিশয্যে পীড়িত; শিল্পসাহিত্য বস্তু সম্বন্ধে বিচ্যুত ভাব কল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি, আলঙ্কারিক আতিশয্য ও দেহগতলীলাবিলাসে ভারগ্রস্থ; জনসাধারণের দেহ-মন বৌদ্ধবজ্রযান – সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক বিদ্ধাচার্য্য ডাকিনী যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকান্ড, তুকতাকে পঙ্গু, উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত তন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির চিত্র সম্পূর্ণ।"[৩৬] মুখ্যতঃ পূর্ব ভারতে হিন্দুধর্মীদের এই দুর্দশা দেখে বোধহয় মিথিলার দরদী কবি ব্যথাভরা লেখনীতে লিখেছেন —

"কত বিদগধজন রস অনুমানই,
অনুভব কাহুক না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ, প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥"[৩৭]

রসের অনুমিতি ছিল, অনুভূতি ছিল না, প্রাণ শীতল করার স্থান ছিল না। একজন প্রাণের মানুষের জন্য, একজন হৃদয় জুড়ান সুহৃদের জন্য সমগ্র জাতি যেন আর্তনাদ করছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেব এবং শ্রীনিত্যানন্দ আনলেন প্রাণ জুড়ানোর সুধা। উন্নত

উজ্জ্বল রসের ধারায় সকল ধারার শুষ্কতা ঘুচিয়ে সমগ্র সমাজকে সঞ্জীবিত করলেন। ভক্তি প্রেমের রসবন্যায় দেশের ধনী-দরিদ্র, পন্ডিত-মূর্খ, পুরুষ-নারী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের প্রেমের ধারায় ভেসে গেল।

প্রদীপের তৈলাধার ছিল, তৈল ছিল, সলতে ছিল কিন্তু প্রজ্জ্বলিত করার মত কেউ ছিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করলেন। তিনি নবদ্বীপ পরিণত করলেন এক মহাতীর্থে। সেই মহাতীর্থের রক্ষাকর্তা এবং প্রধান পুরোহিত হলেন শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি গৌরপ্রেমের আলোয় কেবলমাত্র নবদ্বীপে নয় সমগ্র বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে মানবপ্রেম প্রতিষ্ঠা করলেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর বলেছেন, "জয় নবদ্বীপ ভারত প্রদীপ।"[৩৭] ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রদীপটি নবদ্বীপেই প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। এই ভারতের বিরাট সংস্কৃতির যা কিছু সম্পদ তা যথার্থভাবে দর্শন করতে হলে নবদ্বীপের আলোই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোজ্জ্বল আলো। শ্রীগৌরাঙ্গদেব "কৃষ্ণধর্ম ও কৃষ্ণ এবং মানবপ্রেম অভিন্ন" — এই সত্য জগৎবাসীকে জাগ্রত করে শুধু রক্ষা করেন নি, নাচিয়েও ছিলেন বটে। কেবল-মাত্র জনসাধারণই নয়, রাজা-বাদশা সম্রাট-ও বাদ যান নি। শোনা যায় যে মুঘল সম্রাট আকবর শ্রীগৌর-প্রেমে মুগ্ধ হয়ে একটি পদ রচনা করেছিলেন —

"জিউ জিউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপনি নাচত আপন রসে ভোরা।
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া॥
ঐছন পহুক যাউ বলিহারী।
শাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী॥" (পদকল্পতরু ধৃত)

জীবপ্রেম ও কৃষ্ণপ্রেমের অভিন্নতা জ্ঞাপনের প্রথম উদ্গাতা বাঙলার শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাঁর অভিন্ন হৃদয় শ্রীনিত্যানন্দ।

তথ্য সূত্র

১। গৌর সন্দর্ভ – ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী । পৃঃ ১৫

২। শ্রীচৈতন্যভাগবত – শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর । আদি খন্ড। দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল – জয়ানন্দ মিশ্র । নদীয়া খন্ড

৪। গৌরাঙ্গলীলা মাধুরী – ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী । পৃঃ ১

৫। গৌর সন্দর্ভ – ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী । পৃঃ ১৬

৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত - শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। আদি খন্ড। দ্বিতীয় অধ্যায়।

৭। তদেব – আদি খন্ড। ১১ অধ্যায়।

৮। তদেব – আদি খন্ড । ২৩ অধ্যায়।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত – শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী । আদি লীলা। ১৬ পরিচ্ছেদ ।

১০। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল – জয়ানন্দ মিশ্র । নদীয়া খন্ড ।

১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত – শ্রীল বৃন্দাবন দাস । আদি খন্ড । দ্বিতীয় অধ্যায়।

১২। তদেব – আদি খন্ড । ১০ম অধ্যায় ।

১৩। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল – জয়ানন্দ মিশ্র । নদীয়া খন্ড ।

১৪। শ্রীচৈতন্যভাগবত – শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর । আদি খন্ড। ১০ম অধ্যায়।

১৫। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল – লোচনদাস ঠাকুর । আদি খন্ড ।

১৬। গৌর সন্দর্ভ – ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী । পৃঃ ১৮

১৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল – জয়ানন্দ মিশ্র । নদীয়া খন্ড ।

১৮। মধ্যযুগের চরিত সাহিত্য – শ্রীঅতুল শূর ।

১৯। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর - ডঃ সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ২য় সং । পৃঃ ৪৯৬ ।

২০। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ -- শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী। পৃঃ ১৬৪।

২১। History of Bengal - Stewart, P. 129.

২২। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ – শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী। পৃঃ ১৬৫-৬৬

২৩। History of Bengal - Vol.II - Jadunath Sarkar, P.153.

২৪। Husain Shahi Bengal - Mamtajur Rahman Tarafdar, P.336.

২৫। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল – জয়ানন্দ মিশ্র। নদীয়া খন্ড।

২৬। তদেব।

২৭। শ্রীচৈতন্যভাগবত – শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। আদি। ২য় অধ্যায়।

২৮। তদেব – আদি। ১১শ অধ্যায়।

২৯। শ্রীচৈতন্যভাগবত – শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। আদি। ২য় অধ্যায়।

৩০। শ্রীচৈন্যচন্দ্রোদয় নাটক – কবি কর্ণপূর। ২য় অঙ্ক। ১নং শ্লোক, পৃঃ ৮৮।

৩১। শ্রীচৈতন্যভাগবত – শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। আদি। ১৪ অধ্যায়।

৩২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক - কবি কর্ণপূর। ২।৯

৩৩। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। জয়ানন্দ মিশ্র।

৩৪। বাঙালীর ইতিহাস। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

৩৫। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ – শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী। পৃঃ ১৩

৩৬। বাঙালীর ইতিহাস – ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

৩৭। গৌর সন্দর্ভ – ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। পৃঃ ১৯